RAMAKRISHNA VIVEKANANDA MISSION

SESSION – 2020
Class : - X
Annual Examnation
Subject : Bengali

Full Marks : 90

---

১. বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন : (১x১৭=১৭)

১.১. 'সে যে বর্মায় এসেছে এ খবর সত্য' — উক্তিটির বক্তা
ক. জগদীশ বাবু খ. অপূর্ব গ. রামদাস ঘ. নিমাইবাবু

১.২. নদীর ওপর ব্রিজটি তৈরি ছিল —
ক. বাঁশ দিয়ে খ. ইট, সুরকি, সিমেন্ট, লোহা লক্কড় দিয়ে গ. কাঠ দিয়ে ঘ. ইট দিয়ে

১.৩. বহুরূপীর জীবন শুধুমাত্র কী আশা করে?
ক. স্বীকৃতি খ. সম্মান গ. বক্‌শিশ ঘ. স্বচ্ছল জীবন

১.৪. 'আমরা ভিখারি বারোমাস' — কবির এমন মনে হওয়ার কারণ কী?
ক. মানুষের দারিদ্র্য দেখে তিনি কুণ্ঠিত খ. মানুষের চাহিদা দেখে তিনি লজ্জিত
গ. মানুষের হতাশা দেখে তিনি মুগ্ধ ঘ. মানুষের দুঃখে তিনি কাতর।

১.৫. 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতাটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি —
ক. আমাদের ডান পাশে ধ্বস খ. আমাদের বাঁয়ে গিরিখাদ গ. আমাদের মাথায় বোমারু ঘ. আমাদের ঘর গেছে উড়ে।

১.৬. স্রষ্টা তখন ঘনঘন মাথা নাড়ছিলেন —
ক. আনন্দ বশত খ. অধৈর্যবশত গ. ধৈর্যবশত ঘ. স্থৈর্যবশত

১.৭. প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ বর্নিত 'সোনার-অঙ্গ, হিরের হৃদয়' যুক্ত কলমটির মূল্য —
ক. দু'হাজার ডলার খ. দু-হাজার টাকা গ. আড়াই হাজার পাউন্ড ঘ. আড়াই হাজারদিনার

১.৮. প্রতিশব্দ —
ক. Sensitized Paper খ. News Paper গ. Photographic Paper ঘ. Graph Paper

১.৯. 'কালির অক্ষর নাইকো পেটে — পড়েন কালীঘাটে' শূণ্যস্থান পূরণ করে।
ক. সরস্বতী খ. কালী গ. চন্ডী ঘ. পন্ডিত

১.১০. তির্যক বিভক্তি হল —
ক. এক সঙ্গে সবরকমের বিভক্তি খ. শূণ্য বিভক্তির অন্য নাম গ. এক সঙ্গে বিভক্তি ও অনুসর্গ ঘ. একাধিক কারকে ব্যবহৃত বিভক্তি।

১.১১. অকারক সম্পর্ক পাওয়া যায় —
ক. শুধুমাত্র সম্বন্ধ পদে খ. শুধুমাত্র সম্বোধন পদে গ. সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদে
ঘ. কোনোটিই নয়।

১.১২. ব্যাকরণগত ভাবে 'সমাস' শব্দটির অর্থ —
ক. সম্মেলন খ. সমাসীন গ. ধারণা ঘ. সংক্ষেপ

১.১৩. 'উপকূল' — এই অব্যয়ীভাব সমাসটি গড়ে উঠেছে —
ক. সাদৃশ্য অর্থে খ. পশ্চাৎ অর্থে গ. সামীপ্য অর্থে ঘ. কোনোটিই নয়

১.১৪. বাক্যের মূল উপাদান হল —
ক. উদ্দেশ্য ও বিধেয় খ. উদ্দেশ্য ও কর্ম গ. উপমেয় ঘ. উপমান

১.১৫. সরলবাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া থাকে —
ক. একটি খ. দুটি গ. একাধিক ঘ. একটিও নয়

১.১৬. ‘তুমি অধম বলিয়া

ক. জটিল বাক্য খ. সরল বাক্য গ. যৌগিক বাক্য ঘ. না-সূচক বাক্য

১.১৭. চাঁদ দেখা যাচ্ছে — এটি কী ধরনের বাক্য?

ক. কর্ম বাচ্য খ. কর্তৃবাচ্য গ. কর্মকর্তৃবাচ্য ঘ. ভাব বাচ্য

২. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (যে কোন টি)

২.১. ‘এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের’ — কোন্ বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল?

২.২. এবারে মতো মাপ করে দিন ওদের’ — একথা বলার কারণ কী?

২.৩. ‘তার লাঞ্ছনা এই কালো চামড়ার নীচে কম জ্বলে না তলওয়ার কার!’ — কোন ঘটনায় অপূর্ব ব্যথিত?

২.৪. ‘এক মাইল দূরে নদীর উপরকার ব্রিজের দিকে হাঁটিতে লাগিল’। — কে, কখন এমন কাজ করেছিল?

২.৫. অমৃত শেষ পর্যন্ত কীভাবে তার মাকে তার নতুন জামার প্রয়োজনীয়তাটুকু বুঝিয়েছিল?

৩. ব্যাখ্যা ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (যে কোন একটি) (৩x১=৩)

৩.১. ‘আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন’ — আজ বলতে কোন্ দিনের কথা বোঝানো হয়েছে? কেন আজ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সবচেয়ে দুঃখের দিন! (১+২)

৩.২. ‘রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই’ — কোন গল্পের অংশ? তাৎপর্য কী? (১+২)

৪. রচনাধর্মী প্রশ্ন (যে-কোন একটি) (৫x১=৫)

৪.১. ‘বহুরূপী’ গল্প অবলম্বনে হরিদার চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

৪.২. গিরীশ মহাপাত্রের চেহারা ও পোশাক-আশাকের বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৫. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (যে-কোন চারটি) (১x৪=৪)

৫.১. ‘তারপর যুদ্ধ এল’ — যুদ্ধ কীভাবে এল?

৫.২. ‘আমরা ভিখারি বারোমাস’ — একথা বলার কারণ কী?

৫.৩. বিশ্বমায়ের আসন তারই বিপুল বাহুর ‘পর’ —

৫.৪. ‘হাসিবে মেঘবাহন’ — ‘মেঘবাহন’ কে?

৫.৫. ‘জরায় মরা মুমূর্ষুদের’ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

৬. ব্যাখ্যা ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (যে-কোন একটি) (৩x১=৩)

৬.১. ‘সভ্যের বর্বর লোভ / নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা’ — উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (৩)

৬.২. ‘পঞ্চ কন্যা পাইলা চেতন’ — ‘পঞ্চ কন্যা কারা’? তারা কীভাবে চেতনা পেয়েছিল? (১+২)

৭. রচনা ধর্মী প্রশ্ন (যে-কোন একটি) (৫x১=৫)

৭.১. ‘অভিষেক’ কবিতা অবলম্বনে কবি অন্তরালে যে প্রধান পুরুষ চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছেন — তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করো। (৫)

৭.২. “আমার শুধু একটা কোকিল / গান বাঁধবে সহস্র উপায়ে” — ‘শুধু একটা কোকিল’ আসলে কী? এই গান বাঁধার প্রয়োজনীয়তা কী? (২+৩)

৮. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (যে-কোন তিনটি) (১x৩=৩)

৮.১. কালি তৈরি করতে প্রাবন্ধিককে ছোটো বেলায় কে কে সাহায্য করতেন?

৮.২. ‘কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য’ — কেন?

৮.৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষা সমিতিতে কারা ছিলেন?

৮.৪. ‘আমাদের আলংকালিকগন শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন’ — শব্দের ত্রিবিধ কথা কী?

৯. রচনাধর্মী প্রশ্ন (যে-কোন একটি) (৫x১=৫)

৯.১. ‘যে লোক অজন্ম ইজার পরেছে তার পক্ষে হঠাৎ ধুতি পরা অভ্যাস করা একটু শক্ত’ — ‘ইজার’ কী? কাদের সম্পর্কে এই উক্তি? উক্তিটির নিহিতার্থ ব্যক্ত করো। (১+১+৩)

৯.২. “সব মিলিয়ে লেখালেখি রীতিমতো ছোটোখাটো একটা অনুষ্ঠান।” — লেখালেখি ব্যাপারটিকে ছোটোখাটো অনুষ্ঠান বলা হয়েছে কেন বুঝিয়ে দাও। (৫)

১০. রচনাধর্মী প্রশ্ন (যে-কোন একটি) (৪x১=৪)

১০.১. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মূল নাটকটির নাম সিরাজদ্দৌলা। তাঁর দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটিও 'সিরাজদ্দৌলা' নামে সংকলিত। বিশেষ দৃশ্যের এরূপ নামকরণ সার্থক কি না বিচার করো।

১০.২. "I Know we shall never meet" — কে, কাকে একথা বলেছেন? তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণ কী? (২+২)

১১. রচনাধর্মী প্রশ্ন (যে-কোন দুটি) (৫x২=১০)

১১.১. "ওইটেই তো আমিরে, যন্ত্রণাটাই তো আমি" — বক্তা কে? যন্ত্রণাটা কেমন ছিল? (১+৪)

১১.২. "এটাই ওকে উত্তেজিত করে বোমার মতো কাটিয়ে দেব আসল সময়ে।" — এই ভাবনাটি কার ছিল? কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাবনা তা আলোচনা কর। (১+৪)

১১.৩. কোনি ও ক্ষিতীশ একে অপরের পরিপূরক — আলোচনা কর। (৫)

১২. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (যে-কোন আটটি) (১x৮=৮)

১২.১. বিভক্তি কয় প্রকার কী কী?

১২.২. দ্বিগু সমাসের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

১২.৩. অকর্মক কর্তৃবাচ্যের উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখো।

১২.৪. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য কাকে বলে?

১২.৫. অলোপ সমাস কাকে বলে?

১২.৬. করণে বীপ্সা বলতে কী বোঝো?

১২.৭. কলম সে দিন খুনিও হতে পারে বই কি। — কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করো।

১২.৮. জটিলবাক্য কাকে বলে?

১২.৯. 'প্রণবকে আজ বিকেলে দিল্লি যেতে হবে'। — উক্ত পদটি কোন্ ধরণের ভাববাচ্য?

১৩. প্রবন্ধ রচনা : (যে-কোন আটটি) (১০x১=১০)

১৩.১. সমাজ সেবায় ছাত্র সমাজের অবদান

১৩.২. বাঙালী রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়

১৩.৩. মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

১৩.৪. মানব জীবনে পরিবেশের প্রভাব

১৪. ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ ঃ (৪)

Once two women, quarreling about the claim of a child, went to the judge for justice. The judge called the executioner and ordered, "Cut the child into two halves and give one half to each of the women." One of women, when she heard the order remained silent; but the other woman began to weep.

১৫. সংলাপ অথবা প্রতিবেদন রচনা (যে-কোন একটি) (৫x১=৫)

১৫.১. 'জলা বুজিয়ে, সবুজ ধ্বংস করে আবাসন নয়' — এ বিষয়ে সংবাদ পত্রের উপযোগী একটি প্রতিবেদন লেখো। (৫)

১৫.২. মাতৃ ভাষার সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো। (৫)

উত্তর পত্র

১. ১.১. ঘ. নিমাইবাবু ১.২. খ. ইট, সুরকি, সিমেন্ট, লোহা লক্কড় দিয়ে ১.৩. গ. বক্‌শিশ ১.৪. খ. মানুষের চাহিদা দেখে তিনি লজ্জিত ১.৫. খ. আমাদের বাঁয়ে গিরিখাদ ১.৬. গ. ধৈর্যবশত ১.৭. গ. আড়াই হাজার পাউন্ড ১.৮. ক. Sensitized Paper ১.৯. গ. চন্ডী ১.১০. ঘ. একাধিক কারকে ব্যবহৃত বিভক্তি ১.১১. গ. সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদে ১.১২. খ. সমাসীন ১.১৩. গ. সামীপ্য অর্থে ১.১৪. ক. উদ্দেশ্য ও বিধেয় ১.১৫. ক. একটি ১.১৬. খ. সরল বাক্য ১.১৭. গ. কর্মকর্তৃবাচ্য

২. ২.১. একজন লেখক ও যে সাধারণ মানুষের মতো হতে পারে, তাদের আচরণও যে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই হয়ে থাকে, সেই বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল।

২.২. স্কুলের মাস্টার ছেলেদের পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বহুরূপীবেশে নকল পুলিশ হরিদাকে আট আনা ঘুষ দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে আনা প্রসঙ্গেই উদ্ধৃত লাইনটি ব্যবহৃত।

২.৩. প্ল্যাটফর্ম থেকে বিনা দোষে ফিরিঙ্গি যুবকরা অপূর্বকে লাথি মেরে বার করে দেয় আর সেখানে উপস্থিত দেশি লোকেরাও এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। এই কথা মনে করে অপূর্বর এই মনোবেদনা।

২.৪. বিকেলে চারটা পঁয়তাল্লিশের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিতে রওনা করে দিয়ে এক মাইল দূরে নদীর উপরকার ব্রিজের দিকে হাঁটতে লাগলো।

২.৫. নিজের জামার একটা ছোটো ছেঁড়া জায়গায় আঙুল ঢুকিয়ে অমৃত তার জামাটা আরও ছিঁড়ে দিয়ে মা-কে তার নতুন জামার প্রয়োজনীয়তাটুকু বুঝিয়েছিল।

৩. ৩.১. লেখা গল্প বেরোলে, সে তার মাকে গল্পটি পড়ে শোনাতে যায় — সেই দিনের কথা বলা হয়েছে।

সে দেখে সংশোধনের নামে ছোটো মেসো সেই লেখার আগাগোড়াই বদলে দিয়েছেন। সে যে লেখাটা ছাপতে দিয়েছিল তার সঙ্গে ছেপে আশা লেখায় কোনো মিল নেই। লজ্জায়, অপমানে তপন ভেঙে পড়ে। সে বুঝতে পারে তার লেখা কাঁচা হাতের, তবুও যদি সেই লেখাই ছাপা হত তাহলে তার মনে আনন্দ জন্মাত। আর ছাপা না হলেও এতটা দুঃখ তার হত না।

৩.২. আশাপূর্ণাদেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের অংশ।

জহুরি যেমন কোন্‌টা আসল রত্ন আর কোন্‌টা নয় তা বলতে পারেন, তেমনই একজন লেখকই বলতে পারেন কোন্ লেখাটা ভালো আর কোন্ লেখাটা খারাপ। তাই তপন ভেবেছিল এই লেখার আসল মূল্য শুধু তার মেশোমশাই বুঝবেন।

৪. ৪.১. <u>হরিদা</u> — সুবোধ ঘোষের 'বহুরূপী' গল্পটির কাহিনিই বিকাশ লাভ করেছে হরিদার চরিত্রকে কেন্দ্র করে। অত্যন্ত গরিব মানুষ হরিদা। কোন ধরাবাঁধা কাজ হরিদার পছন্দ নয়। কাজের মধ্যে যুক্তি এবং স্বাধীনতার আনন্দ খুঁজে নিতে চান বলেই বহুরূপীয় পেশা গ্রহণ করেছিলেন হরিদা।

i) হরিদার চরিত্রের মধ্যে সামাজিকতার দিকটি লক্ষণীয়। শহরের সব থেকে সরু গলিটার ভিতরে তার ছোট্ট ঘরটিই কথকদের চারবন্ধুর সকাল-সন্ধ্যার আড্ডার ঘর। চা, চিনি, দুধ কথকরা নিয়ে আসেন আর হরিদা উনানের আঁচে জল ফুটিয়ে দেন।

ii) কখনও বাসস্ট্যান্ডের পাগল, কখনও রাজপথ কাবুলিওয়ালা, ফিরিঙ্গি সাহেব — এরকম অজস্র রূপে তাঁকে দেখা গেছে। শুধু সাজ নয়, চরিত্রের সঙ্গে মানানসই ছিল তাঁর আচরণ। কিন্তু দিনশেষে দারিদ্র্যেই হয়েছে তাঁর সঙ্গী।

iii) হরিদার চরিত্রটি পরিণতির শীর্ষ ছুঁয়েছে কাহিনির শেষে। বিরাগীর বেশে জগদীশবাবুকে মুগ্ধ করে দিলেও তাঁর আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ কিংবা প্রণামি হরিদা প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবেই পেশাগত সততায় অর্থলোভকে তিনি ত্যাগ করেন। বকশিশ ছাড়া বহুরূপীর জীবন আর কিছু অবশ করতে পারে না — হরিদার এ কথা দীর্ঘ-শ্বাশের মতো শোনালেও তা আসলে তাকে সততার আলোয় আলোকিত করে।

৪.২. শরৎচন্দ্র রচিত 'পথেরদাবী' গল্পাংশে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিকে পুলিশের বড়ো কর্তার সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাকে দেখে মনে হয়েছিল তার আয়ু যেন আর বেশিদিন নেই। ফরসা রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু তার শীর্ণ চেহারা দেখে তা মনে হয় না। অল্প কাশির

পরিশ্রমেই সে হাঁপাতে শুরু করেছিল। তাকে নিজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে সে নিজের নাম গিরীশ মহাপাত্র বলেছিল। তার পোশাকও ছিল অদ্ভুত। সে তেলের খনিতে কাজ করত বলে জানায়। বর্মা থেকে সে রেঙ্গুনে এসেছিল। তার ট্যাক থেকে একটা টাকা, লোহার কম্পাস, মাপ করার জন্য কাঠের ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই আর-একটা গাঁজার কলকে বার করা হয়। পুলিশের কর্তা নিমাইবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেন সে গাঁজা খায় কি না। তার উত্তরে গিরীশ মহাপাত্র বলে। গাঁজার কলকেটা সে যে দিয়ে দেবে। তার সাজ পোশাক, আচার-ব্যবহার দেখে সকলেই নিশ্চিত হয় যে, এই গিরীশ মহাপাত্র কখনোই সব্যসাচী মল্লিক হতে পারে না।

৫. ৫.১. কবি পাবলো নেরু দা রচিত। 'অসুখী একজন' কবিতায় রশের এক আগ্নেয় পাহাড়ের মতো যুদ্ধ এসেছিল।

৫.২. 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতায় সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও বিপুল ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ লক্ষ করে কবি শঙ্খ ঘোষ মন্তব্যটি করেছেন।

৫.৩. 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় বিশ্ব-মা বলতে কবি এই বিশাল পৃথিবীকেই বুঝিয়েছেন।

৫.৪. 'মেঘবাহন' হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। উল্লেখ্য যে, দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন মেঘ, তাই তাকে 'মেঘবাহন' বলা হয়।

৫.৫. জড়তাগ্রস্ত মৃতপ্রায় জীবজগৎ নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়।

৬. ৬.১. অরণ্য আর আদিমতার অন্ধকারে থাকা আফ্রিকায় উনিশ শতক থেকে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন শুরু হয়। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ব্রিটেন, জার্মানি, ইটালি-ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশই আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে এবং উনিশ শতকের শেষে প্রায় গোটা আফ্রিকা ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হয়। আফ্রিকাকে লুন্ঠন করে সেখানকার আদিম জনজাতিদের শোষণের যে-ইতিহাস রচিত হয়, এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৬.২. পঞ্চ কন্যা হল — পদ্মাবতী, চন্দ্রপ্রভা, রোহিনী, বিজয়া ও বিধুন্নলা।

সমুদ্র কন্যা পদ্মা শুধু বিধাতার কাছে অচেতন পদ্মাবতীর উপযুক্ত চিকিৎসার যথাসাধ্য চেষ্টা করেনি। পদ্মার আদেশে তাঁর সখীরা অচেতন পদ্মাবতী ও তাঁর সখীদের দেহ বস্ত্রে ঢেকে উদ্যানের মধ্যে নিয়ে যায়। তারপরে তন্ত্র-মন্ত্র-মহৌষধি সহযোগে তাদের মাথায় এবং পায়ে সেঁক দিয়ে প্রাণ ফিরিয়ে আনে তাঁর চার সাথীদের সহযোগে।

৭. ৭.১. <u>ইন্দ্রজিৎ চরিত্র</u> — মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য-র প্রথম সর্গ 'অভিষেক' অংশে প্রকৃত পৌরুষ চরিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ইন্দ্রজিৎ। তাঁর কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় —

1) <u>বীরত্ব ও আত্মবিশ্বাস</u> ঃ ছদ্মবেশী লক্ষ্মীর কাছে লঙ্কার সর্বনাশ এবং বীরবাহুর মৃত্যুর খবর শুনে ইন্দ্রজিৎ বলে উঠেছিলেন, "ঘুচাব ও অপবাদ, বধি রিপুকুলে।" দু-বার রামচন্দ্রকে পরাস্ত করেছেন ইন্দ্রজিৎ। তৃতীয় বারও পরাস্ত করতে আত্মপ্রত্যয়ী ইন্দ্রজিৎ তাই রাবণকে বলেছেন — "সমূলে নির্মূল করিব পাথরে আনি।"

2) <u>কর্তব্য সচেতনতা</u> ঃ ইন্দ্রজিৎ শুধু পিতৃভক্তই নন, তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন। তাই তিনি বলেন — "থাকিতে দাস, যদি যাও রণে / তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ ঘুচিবে জগতে।"

3) <u>স্বদেশ প্রেম</u> ঃ মধুসূদনের ইন্দ্রজিৎ স্বদেশ ও খ্যাতির প্রতি একনিষ্ঠ। তাই তিনি বলে ওঠেন — "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে স্বর্ণলঙ্কা...।"

4) <u>আত্মমূল্যায়নের মানসিকতা</u> ঃ মেঘনাদের চরিত্রের মধ্যে আত্মমূল্যায়নের মানসিকতা দেখাযায়। তাই লঙ্কায় দুর্দশা এবং বীরবাহুর মৃত্যুর পরে তিনি নিজেকে ধিককার দিয়েছেন — "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল... মাঝে!"

5) <u>পত্নীর প্রতি গভীর অনুরাগ</u> ঃ প্রমীলার সঙ্গে ইন্দ্রজিতের দাম্পত্য সম্পর্কটিও ছিল অত্যন্ত মধুময়। প্রমীলা ইন্দ্রজিৎকে না ছাড়তে চাইলে ইন্দ্রজিৎ বলেছেন যে তাঁকে প্রমীলার দৃঢ় বন্ধন থেকে আলাদা করার ক্ষমতা কারোরই নেই।

মধুসূদনের কাছে ইন্দ্রজিৎ ছিলেন 'favourite Indrajit'। সেই পক্ষপাত এবং সহানুভূতি এখানেও ইন্দ্রজিৎ চরিত্রে দেখা যায়।

৭.২. জয়গোস্বামী রচিত 'অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান' কবিতায় প্রকাশ্যে এসেছে যুদ্ধ তান্ডবের প্রতি প্রতিবাদের ভাষা। মাথার উপরে 'শকুন' বা 'চিল' অর্থাৎ যুদ্ধবাজ শক্তিকে দেখেও ভরসা রেখেছেন নিজের শুভবোধে, যা সামাজিক বিশৃঙ্খলা, ধ্বংস এবং হত্যার উন্মাদনকে আটকাতে পারে। এই শুভবোধ এবং সৃষ্টিশীল সত্বাকেই করি 'এক্টা কোকিল' বলে অভিহিত করেছেন। একমাত্র উপায় করে তুলতে চেয়েছেন। সৃষ্টিশীল সতারই আনন্দময় প্রকাশ

হল সংগীত। এই সংগীতই তার অপূর্ব আবেশের মাধ্যমে মানুষকে পৃথিবীর যাবতীয় জ্বালা; যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়, ভুলিয়ে দেয় সভ্যতার ওপরে নেমে আসা অস্ত্রের অভিশাপ। যেসব যুদ্ধপ্রিয় বন্দুকবাজরা ধ্বংস করতে চায় পৃথিবীকে, তাদের আগ্রাসী হিংসার ওপরে মায়াময় এক প্রলেপ দিয়ে যায় সংগীত। তাই, গানকে কবি ব্যবহার করেছেন অস্ত্রের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে। 'গানের বর্ম' পরে কবি সহজে বুলেটকে প্রতিহত করতে পারেন। এই গানইতাকে হাজার মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে। তাঁকে এগিয়ে যাওয়ার, উঠে দাঁড়ানোর শক্তি জোগায়। যাবতীয় রক্তাক্ত তাকে ভুলে যেতে সাহায্য করে এই গান। এই কারণেই সহস্র উপায়ে গান বাঁধা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

৮. ৮.১.

৮.২. কলম অতি সস্তা এবং সর্বভোগ্য হওয়ার ফলে পকেটমারও কলম চুরি করে না। তাই বলা হয়েছে তাদের কাছে কলম অস্পৃশ্য।

৮.৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত পরিভাষা সমিতিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত এবং লেখকরা নিযুক্ত ছিলেন।

৮.৪. শব্দ সম্পর্কে আলংকারিকরা অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা এই তিনটি বৃত্তির কথা বলেছেন।

৯. ৯.১. 'ইজার' কথার অর্থ হল পায়জামা বা পাজামা বা প্যান্টালুন।

ইংরেজি জানা এবং ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান পড়তে অভ্যস্ত মানুষদের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আলোচ্য মন্তব্যটি করেছেন।

প্রথম শ্রেণির পাঠকদের সম্পর্কে লেখক উদাহরণ স্বরূপ নিজের প্রসঙ্গ তুলেছেন। বলেছেন জ্যামিতি শিখেছেন। কিন্তু সমস্যাটা যাঁরা ইংরেজি ভাষায় দক্ষ এবং তাতেই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এদের মনে 'ভাষা গত বিরোধী সংস্কার' তৈরি হয়। অর্থাৎ বাংলায় কিছু শেখার সময় এদের ইংরেজিতে শেখা জ্ঞান বাধা হস্যে দাঁড়ায়। এই 'পূর্ব সংস্কার দমন করে' তাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের পাঠ গ্রহণ করতে হয়। যা তাদের পক্ষে শ্রম ও সমস্যার। বিষয়টা আজন্ম ইজার পরা লোকের হঠাৎ ধুতি পড়তে বাধ্য হওয়ার মতো। অত্যন্ত মনোযোগ আর আগ্রহের সঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

৯.২. একসময় রোগা বাঁশের কঞ্চি কেটে কলম তৈরি করা হত। কালি যাতে গড়িয়ে না পড়ে তার মুখটা চিরে দেওয়া হত। লেখা হত কলার পাতায়। কালিও নিজেদের তৈরি করতে হত। কাঠের উনুনে রান্না করা কড়াই-এর তলার কালি লাউ পাতা দিয়ে ঘষে তুলে তা পাথরের বাটিতে রেখে জলে গোলা হত। তারপর খুন্তি দিয়ে পুঁড়িয়ে জলে ছ্যাঁকা দিয়ে ফোটানো হত। বাঁশের কলম, মাটির দোয়াত, ঘরে তৈরি কালি আর কলাপাতা নিয়েই লেখকের প্রথম লেখালেখি। শহরের হাই স্কুলে ভরতি হওয়ার পরে বাঁশের বা কঞ্চির কলমকে ছুটি দেওয়া হয়। কালি বানানোও বন্ধ হয়ে যায়। কাচের দোয়াতে এই কালি বানানো হত কালি ট্যাবলেট বা বড়িগুলি দিয়ে। তৈরি কালি পাওয়া যেত দোয়াতে। ফাউন্টেন পেনের জন্য ছিল বিদেশি কালি। রকমারি নিব ও হ্যান্ডেল ছিল। ফাউন্টেন পেনকে প্ল্যাটিনাম, সোনা ইত্যাদি দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত। এই পর্যায়ে দোয়াত কলম হয়ে গেল ঘর সাজাবার আসবাব। এক সময় লেখা শুকানো লেখা লেখি এভাবে এক অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। প্রথম যুগে তার চেহারা ছিল একরকম, পরবর্তীকালে সেই রূপের বদল ঘটল।

১০. ১০.১. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি পাঠ্যাংশে সংকলিত হয়েছে। সংকলকগণ মূল নাটকের শিরোনামটিই এখানে বজায় রেখেছেন। দৃশ্যটির ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ করলে নামকরণটি অপরিবর্তিত রাখার যৌক্তিকতাও সার্থকতা বোঝা যাবে।

নাট্য দৃশ্যটিতে উপস্থাপনার মূল বিষয় হল নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে সংগঠিত ষড়যন্ত্র এবং তারজন্য নবাবের মানসিক উদ্‌বেগ। বাইরে ইংরেজ আর ঘরে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর এবং নিজের মাসি ঘসেটি বেগমের যৌথ ষড়যন্ত্র সিরাজকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। নিজের যাবতীয় অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে বাংলাকে রক্ষার জন্য কর্মচারীদের কাছে তিনি নতজানু হয়েছেন। মাত্র পনেরো মাসের রাজত্বকালে দরবারি ষড়যন্ত্রে, মানুষের নির্মমতায়, আপনজনদের প্রতিহিংসায় সিরাজ মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। নাট্যদৃশ্যের উপসংহার তার উক্তির মধ্যে ধরা পড়েছে অন্তহীন ব্যর্থতা — "পলাশি! লাখে লাখে পলাশ-ফুলের অগ্নি বরমে কোনোদিন হয়তো পলাশির প্রান্তর রাঙা হয়ে থাকত, তাই আজও তার বুকে রক্তের তৃষা।" সিরাজের উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা,

হতাশা, দেশপ্রেম নাটকটির মুখ্য উপজীব্য বলে আমার মতে 'সিরাজদ্দৌলা' নামকরণটিই যথার্থ বলে মনে হয়।

১০.২. আলোচ্য অংশটি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত সিরাজদ্দৌলা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে সংকলিত। সিরাজদ্দৌলা' পাঠাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা দরবারে বাংলার সিরাজ দ্দৌলার উদ্দেশ্যে করেছিলেন ইংরেজরা বাংলার ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আযোজন। শুরু করলে ফরাসিদের পক্ষে তা ঠেকানো মুশকিল হয়ে পড়ে। কারণ, এর আগে ফরাসিরা ইংরেজ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দুর্গনির্মানের চেষ্টা করলে নবাবই তাতে আপত্তি জানান। নবাবের আদেশ ফরাসিরা শিরোধার্য করলেও ইংরেজরা তা মানেননি। ফলে বাংলায় সামরিক শক্তিতে পিছিযে থাকা ফরাসিদের পক্ষথেকে মঁসিয়ে লা সামরিক সাহায্যের আশায় নবাবের কাছে আসেন। কিন্তু সিরাজের পক্ষে সেই মুহূর্তে এই প্রত্যাশা পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, কলকাতা জয়ে এবং পুর্নিয়ার যুদ্ধে তাঁর লোকবল ও অর্থবল যথেষ্ট কমে যায়। ফলে নবাবের কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে ব্যথিত ফঁসিয়েলা এ কথা বলেন।

১১. ১১.১. মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে শেষ দিনের ৪x১০০ মিটারে রমা যোশির মতো প্রখ্যাত সাঁতারুকে হারিয়ে কোনি জেতে। কোনিকে অভিনন্দন জানাতে আসা বহু মানুষের ভিড়ে সে ক্ষিতীশকে দেখতে পায়নি। শেষে ক্ষিতীশকে পেয়ে সে রেগে গিয়ে তার বুকে দুমদুম ঘুষি মারতে থাকে আর বলে যে, সে যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছিল। এই কথার প্রসঙ্গে ক্ষিতীশ আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

দীর্ঘদিনের কঠিন পরিশ্রমের ফল পেয়েছে কোনি। এই কোনির জন্যই ক্ষিতীশ সংসার ভুলেছেন, নিজের ব্যক্তিসুখ বিসর্জন দিয়েছেন। শুধু কোনি নামক একটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে ক্ষিতীশ বহুলাঞ্ছনা-অপমান সহ্য করেছেন। তবু তিনি কখনও ভেঙে পড়েননি। সবসময় বুকের মধ্যে অনুভব করেছেন জুপিটারের সতীর্থদের কাছ থেকে পাওয়া অপমানের তীব্র যন্ত্রণা। হয়তো এই যন্ত্রণাটা থাকলে ক্ষিতীশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারতেন না, তৈরি করতে পারতেন না কোনিকে। সত্যিই ক্ষিতীশ নিজেই একটা প্রতিজ্ঞার নাম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাঁবু ছাইয়ে উঠেছেন ইস্পাত কঠিন। আলোচ্য উক্তিটি প্রকৃত পক্ষে ক্ষিতীশের সংগ্রামী তেনারই উদ্ভাসিত রূপ।

১১.২. মতি নদী রচিত 'কোনি' উপন্যাসে উল্লিখিত ভাবনাটি ক্ষিতীশের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

চিড়িয়াখানায় ক্ষিতীশের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে নিজেদের কাছে জল না থাকায় কোনি গিয়েছিল কিছু দূরে স্কুল ছাত্রীদের কাছে জল চাইতে। কিন্তু তাদের শিক্ষিকার দ্বারা সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এই ঘটনায় কোনি বুঝতে পেরেছিল যে, বড়োলোকেরা গরিবদের ঘেন্না করে। এই সব কথাই যখন সে ক্ষিতীশকে বলেছিল, তখন সেই স্কুল ছাত্রীদের মধ্যে একটি মেয়ে প্লাস্টিকের দুটি গ্লাসে জলভরে নিয়ে তাদের কাছে আসে এবং শিক্ষিকার আচরণের জন্য তাদের কাছে ক্ষমা চায়। ক্ষিদ্দা এবং কোনি দুজনেই চিনতে পারে যে, মেয়েটি হল বালিগঞ্জ সুইমং ক্লাবের হিয়া মিত্র। এই সময় কোনি অত্যন্ত অস্বাভাবিক একটা আচরণ করে। হিয়া মিত্রর হাতে ধরে থাকা গ্লাসে সে হাত দিয়ে আঘাত করে। আর তার ফলে সেটি ছিটকে ঘাসের ওপরে পড়ে যায়। এই ঘটনায় হিয়া এবং ক্ষিতীশ দুজনেই হতভম্ব হয়ে যায়। তারপর ক্ষিতীশ কোনির হয়ে হিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। এই ঘটনার জন্য ক্ষিতীশ ভেবেছিলেন কোনিকে খুব বকবেন। কিন্তু শেষ অবধি তিনি কিছুই বললেন না। কারণ, ক্ষিতীশ বুঝতে পেরেছিলেন যে এই হিয়া মিত্রই কোনির ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই তিনি মনে মনে ঠিক করে নেন যে, কোনির হিয়ার প্রতি এই হিংস্র আক্রোশটা ভোঁতা করে দেওয়া কখনোই ঠিক কাজ হবে না। সেই আক্রোশই কোনি বুকের মধ্যে পুষে রাখুক যা কিনা তাকে একদিন সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে।

১১.৩. রত্ন ক্ষিতীশের তিল তিল ভালোবাসা আর প্ররিশ্রমেই কোনি হয়ে উঠেছে তিলোত্তমা।

গঙ্গার ঘাটে বারুনী তিথিতে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা আম দখলের ঘটনা থেকেই ক্ষিতীশ কোনিকে আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর একদিন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের কুড়ি ঘণ্টা হাঁটা প্রতিযোগিতার শেষে কোনিকে কাছে পেয়ে সাঁতার শেখানোর প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলেন তিনি। কোনি সেই প্রস্তাব এক কথায় বাতিল করে দিলেও ক্ষিতীশ হাল ছাড়েননি। তিনি মনে মনে ঠিক করে নেন যে, কোনিকে তিনি নাম করা সাঁতারু তৈরি করবেনই। কোনির বাড়ি গিয়ে ওদের পরিবারের খোঁজখবর নিয়ে দেখেন ওরা খুব গরিব। তাই নিজেই কোনির দায়িত্ব নিলেন। জুপিটার ছেড়ে অ্যাপোলো ক্লাবে এলেন শুধু কোনির জন্যই। নিজের সংসার, পরিবারের কথা ভুলে কোনিকে নিয়েই চললো তার প্রতিজ্ঞাপূরণের কাজ। কোনিকে কঠোর অনুশীলনের মধ্যে রেখে চাম্পিয়ান বানানোই

ছিল ক্ষিতীশের একমাত্র লক্ষ্য। ক্ষিতীশ নিজেই কোনির জন্য উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করলেন। ধীরে ধীরে কোনিও সাঁতার কে ধ্যানজ্ঞান মনে করতে শিখল। কোনি সাঁতারে চ্যাম্পিয়ান হবে বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন। এক সময় যাবতীয় প্রতিকূলতা অতিক্রম করে কোনি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়ানশিপে ৪x১০০ মিটার রিলেতে প্রথম হয়ে তার নিজের এবং ক্ষিতীশের স্বপ্ন পূরণ করল। ক্ষিতীশ না থাকলে কোনির উত্থান কখনোই সম্ভবপর হত না।

১২. ১২.১. বিভক্তি মূলত দু'প্রকার — ক. ধাতু বিভক্তি খ. শব্দ বিভক্তি

১২.২. রাজ্যের যেসব পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। তাদের অকারক পদ বলে। অকারক পদ দুটি — ক. সম্বন্ধ পদ খ. সম্বোধন পদ।

১২.৩. ক. পূর্বপদ সংখ্যা বাচক বিশেষণ হয় — <u>তিন</u> কড়ি

খ. দু'য়ের অধিক বোঝাতে সমাহার শব্দের ব্যবহার — তিন কড়ি — তিন কড়ির সমাহার

১২.৪. যে কর্তৃবাচ্যে অকর্মক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তাকে অকর্মক কর্তৃবাচ্য বলে। যথা — উৎপল দিল্লি গেছে। (বাচ্যে অকর্মক ক্রিয়া ব্যবহৃত)

১২.৫. যে সকল বাক্যের দ্বারা আদেশ, উপদেশ বা অনুরোধ পেশায়, যে সমস্ত বাক্যকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলা হয়। যথা — উদা — রাস্তা দেখে পার হবে।

১২.৬. সমাস নিষ্পন্ন হওয়ার পরেও পূর্বপদের বিভক্তি চিহ্ন লোপ না পেয়ে, সমস্যমান পদের মতো থেকে গেলে, তাকে আলোপ সমাস বলে।

যথা — মনের মানুষ — মনের মানুষ

এখানে পূর্বপদ 'মন' - এর সঙ্গে 'এর' বিভক্তিটি আছে তা সমাসবদ্ধ হওয়ার পরও থেকে গেছে।

১২.৭. করণ কারকে কোন একই শব্দের পুনরাবৃত্তি বোঝালে — করণে বীপ্সা হয়। যথা — <u>হাতে হাতে</u> কাজ করো।

১২.৮. কলম দিয়ে সে দিন খুন হতে পারা যায় বই কি।

১২.৯. যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ডবাক্য এবং তার আশ্রিত এক বা একাধিক অপ্রধান খন্ডবাক্য থাকে, তাকে জটিল বাক্য বলে।

উদা — যখন বরযাত্রী আসবে তখন আমরা খেতে বসব।

১২.১০. উদাহরণটি — অবশ্যকতা বোধক ভাব বাচ্য।

১৩. ১৩.১. সমাজ সেবায় ছাত্র সমাজ

● <u>ভূমিকা</u> : ছাত্র ছাত্রীরা হল যৌবনের দূত, নতুন যুগের বার্তাবাহক। তাদের কাঁধেই ভর করে নবযুগের আগমন ও পুরাতনের বিদায়। ঝড় ঝঞ্ঝা বাত্যা বিক্ষুব্ধ রাতে তাদের যাত্রা 'নাঙ্গা পায়'। তাদের পায়ের তলায় মূচ্ছে তুফান, ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল'। তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস, কর্মে তাদের নিরলস উৎসাহ। তাদের এই অপরিসীম শক্তি, সাহস ও বল নিয়ে তারা যদি সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করে, তবে দেশ ও জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে পারে।

● <u>ছাত্রদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য</u> : চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ছাত্র সমাজ দুর্বার, দুর্জয়। তাদের বক্ষে সাহস। চক্ষে নুতন যুগের স্বপ্ন। পুরাতন কুসংস্কারের জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে নুতন যুগের সরিৎ প্রবাহ তারাই নিয়ে আসতে পারে। স্রোতহারা সমাজে গতির প্রাণধারা তারাই প্রবাহিত করে দেয়। তারা সংগ্রামী মানসিকতার বাহক। ১৮ বছর বয়সেই উদার মানসিকতা নিয়েই তারা কিছু করে দেখাতে চায়। তার জন্য তাদের উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই।

● <u>সমাজের প্রতি কর্তব্য</u> : একটি শিশু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের কাছে সে ঋণী, এই ঋণ তাকে আজীবন শোধ করতে হয় তাই প্রতিটি ব্যক্তিরই সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সমাজ শিশুর বাসস্থান দেয়, তার অন্ন বস্ত্র জোগানের ভার গ্রহণ করে। দেশের মাটিতে উৎপন্ন ফসলে তার কলেবর বৃদ্ধি পায়। সে বড়ো হয়। পরিবার ও সমাজ তাকে সবরকম নিরাপত্তা বিধান করে। তার পড়াশুনা করা এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সবরকম ব্যবস্থা করে দেয়। যে সমাজ থেকে সে সবরকম সুবিধা গ্রহণ করে বড়ো হয়েছে, সেই সমাজের প্রতি সে আজন্ম ঋণী। দেয়া নেয়ার উপরই সমাজ টিকে থাকে। ছাত্ররা সমাজমুখী কল্যাণকর কর্ম করে সমাজের প্রতি ঋণ শোধ করতে পারে। আর্ত ও অসহায় মানুষের সেবা করে, অসহায়কে সাহায্য করে, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় প্রদানের

ব্যবস্থা করে। দুঃখীর দুঃখ দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টার মাধ্যমেই এই ঋণ কিঞ্চিত শোধ করা যায়।

● কর্তব্যবোধ ও ছাত্রসমাজ : ছাত্র সমাজের মধ্যে যদি কর্তব্যবোধের জাগরণ ঘটে তবে তারা সমাজের জন্য অনেক কিছুই করতে পারে। অনেক কিছু করার জন্য সে মানসিকতা তা তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। ছোটবেলা থেকেই মা, মাটি ও সমাজ সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে পরিবারের ভূমিকা সর্বপ্রথম। পরিবারে যদি সে কিছু দেয়া ও উদারতার শিক্ষা লাভ করে তবে পরবর্তী জীবনে সে তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবে। বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের এই মানসিকতা সৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা বেশি সহায়ক। কারণ — তখন তাদের সুকুমার মনোবৃত্তিগুলির সুষ্ঠু বিকাশের সময়। এসময় তাদের যা শিক্ষা দেওয়া যাবে পরবর্ত্তীকালেই তা বাস্তবে রূপান্তরিত হবে। মানসিকতার উন্নতির মাধ্যমে সমাজসেবার গঠনমূলক দিকটিকে তুলে ধরা ও তাদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। ছাত্র যদি শুধু নিজের কেরিয়ার গঠনের ইঁদুর দৌড়ে। সারাদিন ছুটাছুটি করে তবে আশেপাশের লোকজনের দিকে তাকাবার সময় তার কখন? পরিবারের লোকদের দিকে তাকাবার সময়ই তার থাকে না, সমাজতো দূরের কথা। বর্তমান ছাত্রসমাজ স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। বৃহৎ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গুঁটিপোকার মত নিজের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। শুধু ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নে তারা বিভোর। তাই সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে তাদের যুক্ত করতে হবে।

বিদ্যালয়গুলিই প্রথম এই বোধের বীজ নানা কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে রোপণ করতে পারে। সমাজের সঙ্গে তারা যদি একাত্ম না হতে পারে, তবে সমাজের জন্য কিছু করার অনুপ্রেরণাও তারা লাভ করবে না। আমাদের দেশে যেখানে এখনও শতকরা চল্লিশজন অশিক্ষিত, দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। শাসক সম্প্রদায় তাদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। তাদের যা বোঝানো হচ্ছে তাই তারা বুঝছে। এমন অবস্থায় ছাত্র সমাজের অনেক করণীয় আছে। ছাত্রসমাজ তথা যুব সমাজকে পিছিয়ে রেখে, মানবকল্যানে উদ্বুদ্ধ না করে দেশের অগ্রগতি ও হবে ব্যর্থ।

● কর্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা : ছাত্রসমাজকে সুষ্ঠুপথে সমাজ সেবায় উদ্বুদ্ধ করতে গেলে দরকার নির্দ্দিষ্ট কর্মপন্থা। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে সমাজসেবামূলক কর্মসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শুধু কতগুলি তত্ত্ব কথা মুখস্ত করলেই চলবে না। তত্ত্ব কথাগুলিকে জীবনে রূপায়িত করতে হবে। এজন্য শিক্ষাব্যবস্থার কিছু সংস্কার করা উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে উদার মানসিকতা সৃষ্টি করা দরকার। ছাত্রদের মধ্যে যে শুভ চেতনা ও বোধ আছে, সেগুলি যাতে উপযুক্ত বিকাশ সাধন করে তাদের মধ্যে সমাজসেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। বাইরের প্রচেষ্টা ও তাদের অন্তর্নিহিত শুভ ইচ্ছার সন্মিলিত ধারাই পরবর্ত্তীকালে সমাজসেবা করার ইচ্ছায় পরিণত হবে। কারণ সমাজসেবীরা গড়ে ওঠেন না, সমাজসেবী হয়ে ওঠার ক্ষমতা সহজাত। এই ক্ষমতাকে বর্ধিত করার জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী ও মূল্যায়ণ দরকার। শুধু এন এস এস বা এন সি সি করলেই হবে না, একজন সমাজসেবক ও দেশরক্ষাকারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে গেলে চাই যথার্থ লক্ষ্য ও মানসিকতা এবং সেই মানসিকতার উপযুক্ত লালন।

● উপসংহার : বর্তমানে দেখা যায় ছাত্রসমাজ অনেক ক্ষেত্রেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার জন্য দায়ী ছাত্রসমাজ নয়। স্কুল কলেজে বাধ্যতামূলক সমাজসেবার কার্যসূচির প্রচলন চাই। তবেই ছাত্রদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সমাজসেবার মানসিকতা গড়ে উঠবে। তবে ধ্বংসমূলক কার্যকলাপ ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা দূর হয়ে তাদের মধ্যে সমাজের মঙ্গল করার ইচ্ছা জাগরুক হবে। স্বামিজী তাই বলেছেন, 'শিক্ষা হল মানবের অন্তর্নিহিত সত্ত্বার জাগরণ — যা সমাজসেবার মাধ্যমে ঘটতে পারে। যা দিয়ে তাদের শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নিয়ে গড়ে তুলতে হবে। তবেই দেশ জাতি ও ছাত্র উভয়েরই মঙ্গল।

১৩.২. বাঙালী রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়

● ভূমিকা : আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা ভারতবাসী। আমরা বাসকরি এই বঙ্গে তাই আমরা বাঙালি। ২৫শে জুলাই, ২০১২ আজ বাঙালির গর্বের ও আনন্দের দিন, কারণ প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রনব মুখার্জী, চারদিকে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের হিল্লোল - মিষ্টি বিলানো এবং আবির রাঙানো / মাখানো। রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রথম লড়াই শুরু করেছিলেন কৃষবকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৫২ থেকে ২০১২ একদিনে কতটা পূর্ণ হল। ৩ জন মোট বাঙালি রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এতদিনে বাজিমাত করলেন কীর্নাহারের সর্বকায় বাঙালি সন্তান। প্রণববাবুর পূর্বে কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩বার এবং আর. এস. সি-এর নেতা ত্রিদিব চৌধুরী

রাষ্ট্রপতি পদের জন্য লড়াই করেছেন। প্রনববাবু প্রায় ৪ লক্ষ ভোটে জিতেছেন।

● জন্ম, বাল্যকাল ও শিক্ষা : প্রণববাবুর জন্ম ১৯৩৫ সালে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে। জন্মস্থান বাংলার দরিদ্র গ্রাম মিরাটি। বীরভূমের কীর্ণাহার থেকে মাইল দুয়েক দূরে। পিতার নাম কামদাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। পিতা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, গান্ধিবাদী নেতা। জ্ঞান হয়ে কামদাশংকর মুখোপাধ্যায়ের থেকে ছোট প্রণব দেখেছেন যে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে মাসের পর মাস বাড়ির বাইরে থেকেছেন পিতা। কখনও গ্রেফতারও হয়েছেন। অনেক সময় পিতাকে বাঁচাতে রুখে দাঁড়িয়েছেন ছোট্ট প্রণব। তার ছাত্র জীবন ছিল খুবই সাধারণ। কীর্ণাহারের একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। বিদ্যালয়টি ছিল টিনের, দরজা জানলা বিহীন। গোরু ছাগল প্রবেশ করে বিদ্যালয়গৃহ অপরিষ্কার করে রাখত। ছাত্রদের রোজকার কাজ ছিল ক্লাসঘর পরিস্কার করা। যে কিশোরটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজটি করত তিনিই আজ ভারতের প্রথম নাগরিক। বাল্যকালে সহপাঠীদের মধ্যে নিয়ম চালু করলেন ইংরেজীতে নিজেদের মধ্যে কথা বলার। যে পারবে না তাকে জরিমানা দিতে হবে। পল্টুকে কোন দিনই জরিমানা দিতে হয়নি। ফুটবল খেলতে চাইত না। খেললেও মাঠে নেমে সাইড লাইনে বসে বই পড়ত। বই পড়ার অসম্ভব নেশা ছিল। সহপাঠীর ভাষায় "ক্লাস টেনে যখন উঠল তখনই প্রণব একটা ছোটোখাটো লাইব্রেরি।" ফুটবল খেললে তিনি ডিফেন্স করতেন। তাঁর এক বন্ধুর ভাষায় — "ফুটবল যে ডিফেন্স করত সেটা তার দল আর দেশের জন্য এতদিন করে গিয়েছেন। ডিফেন্স করতে করতেই ও আজ দেশের সর্বোচ্চ পদে পৌঁছেছে। আশারাখি, এক্ষেত্রেও ভালো ডিফেন্স করবে।" নেতা হওয়ার গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। একবার বিদ্যালয়ে মিথ্যা জরিমানায় প্রতিবদ স্বরূপ তাঁর নেতৃত্বেই ছেলেরা ক্লাস বয়কট করে। বাল্যকালে অনেক সময় বর্ষার দিনে আল পথ জলে ডুবে গেলে স্কুল ইউনিফর্ম ছেড়ে গামছা পরে জল পাড় হয়ে কোনো উঁচু জায়গায় উঠে আবার ইউনিফর্ম পরে ক্লাসে প্রবেশ করতেন।

তারপর কোলকাতায় আগমন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাস ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম. এ পাশ করেন। এরই সঙ্গে এল. এল. বি ডিগ্রিও অর্জন করেন।

● কর্মজীবন ও রাজ নৈতিক জীবন : কলকাতার ডাক ও তার বিভাগে কেরানি হিসাবে কর্ম জীবন শুরু। তারপর স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা, সঙ্গে সাংবাদিকতার কাজও করেন। ষাটের দশকে তিনি দঃ চব্বিশ পরগণার বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষক ছিলেন।

প্রথম রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি অজয় মুখোপাধ্যায়ের নিকট, ১৯৬৯ সালে যোগ দেন জাতীয় কংগ্রেসে। সেই বছরই ইন্দিরা পন্থীদের প্রার্থী কৃষ্ণমেনন মেদিনীপুরের উপনির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছিলেন। কৃষ্ণ মেননের নির্বাচিত এজেন্ট ছিলেন প্রণব মুখার্জী। তাঁর কৌশলেই মেননের ইন্দিরাগান্ধীর নজরে পড়েন। তাঁকে রাজ্য সভায় নিয়ে আসেন।

তিনি শাঘ্রই ইন্দিরা গান্ধির আস্থা ভাজন হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ পর্যন্ত পাঁচবার রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছে। দুবার জিতেছেন লোকসভা থেকে ২০০৪ এবং ২০০৯এ। তাঁর পদচারনা বানিজ্য থেকে অর্থ মন্ত্রক, বিদেশ থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, যোজনা কমিশনের চেয়ার পার্সন, লোকসবার নেতা। বহুরূপে তিনি কংগ্রেস দলে থেকে দেশের সেবা করেছেন।

মনমোহনের আমলে তিনিই ছিলেন ইউপিএ সরকারের সঙ্কটমোচনে প্রধান ব্যক্তি। মনমোহন বিদেশে গেলে তিনি মন্ত্রীসভার বৈঠক আহ্বান করতেন। ইন্দিরা গান্ধির সময় ছিলেন অঘোষিত 'নম্বর টু'। রাজনৈতিক জীবনের শেষেও ফিরে এসেছিলেন সেই স্থানে।

খাদ্যাভাস, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে নির্ভেজাল বঙ্গ সন্তান হয়েও তিনি বরাবরই দিল্লির বাসিন্দা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সর্বভারতীয়। তবুও জঙ্গীপুর থেকে লোকসভায় জিতে সেই অঞ্চলের প্রতি তাঁর একটু স্পর্শকাতরতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই অঞ্চলের পথ-ঘাট, জলের ব্যবস্থা, প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির দিকে নজর দিয়েছিলেন। তাই জঙ্গীপুরের শিশুদের কাছে তিনি 'দাদু' বলেই পরিচিত।

● শপথ গ্রহণ : তিনি তাঁর চিরাচরিত ধুতি-পাঞ্জাবি নয়, সংসদের সেন্ট্রাল হলে শপথ নিলেন শেরওয়ানি পরে। ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রণব মুখার্জির প্রথম চমক। এই অনুষ্ঠানে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতির প্রথম ভাষণে প্রণব মুখার্জির বক্তৃতা নিয়মতান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা রইল না। তিনি দেশের দরিদ্র

মোচনের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন — "অনাহার থেকে বড়ো অপমান আর হয় না। যারা নীচে রয়েছেন তাদের উপরে তুলে আনতে হবে, যাতে আধুনিক ভারতের অভিধান থেকে দরিদ্র শব্দটাই মুছে যায়।"এ দিন তাঁর বক্তৃতায় সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই আসলে 'চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ'। বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বলেন — "ভারতের উদয় হবে, তবে পেশি শক্তি দিয়ে নয়, মনের শক্তি দিয়ে। ধ্বংসের ধ্বজা উড়িয়ে নয়, শান্তি ও প্রেমের ধ্বজা উড়িয়ে।"

সচরাচর সকলের মতো নিয়ম করে বছরে দুদিন তিনি মহাত্মা গান্ধির সমাধি স্থল রাজঘাটে যান না, কিন্তু ২৫শে জুলাই শপথ গ্রহণের পূর্বেই তিনি রাজঘাটে গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়েছিলেন।

● উপসংহার : নতুন রাষ্ট্রপতির প্রতি সবারই একই জিজ্ঞাসা যে তিনি শিশুর রাষ্ট্রপতির প্রোটোকল অনুযায়ী 'রাবার স্ট্যাম্প' রাষ্ট্রপতি হবেন ? — নাকি তাঁর কর্মের মাধ্যমে কোনো নতুনত্বের আভাস পাওয়া যাবে ? অনেকেই আশা করেন প্রনব মুখার্জি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হবেন না। প্রণববাবুর প্রথম বক্তৃতায় তার ইঙ্গিত রয়েছে।

১৩.৩. মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

● বিজ্ঞান চর্চা ও ভাষার গুরুত্ব : কবি একস্থানে বলেছেন — "মাতৃভাষায় বিজ্ঞান দূর করে অজ্ঞান / শিক্ষা পূর্ণ করি ভরে তোলে মহাপ্রাণ"। প্রকৃতির রহস্যের প্রতি অপার বিস্ময়ের অনুভূতি নিয়ে, আমাদের যেদিন কৌতুহল সঞ্চার হয়েছিল, সেদিন থেকেই শুরু বিজ্ঞানচর্চার। গত শতকের প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের ভাষায় রয়েছে বিজ্ঞানচর্চার উদ্ভবের বিবরণ — 'আমাদের সব অনুভূতির মধ্যে সুন্দরতম হল বিস্ময়। এই আদি অনুভূতি থেকেই জন্ম নিয়েছে প্রকৃত শিক্ষা এবং প্রকৃত বিজ্ঞান।' বিস্মিত ইতিহাসের অজানা সব মানুষের হাত ধরে প্রাচীন সভ্যতা হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো, ব্যাবিলন, গ্রীস-রোমের যুগ পার করে আরবের স্বর্নসন্ধানী আলকিসিয়াদের স্বপ্নের পথ অতিক্রম করে এই একবিংশ শতাব্দীর বুকে ও বিজ্ঞানের চর্চা শুধু অব্যাহতই থাকেনি, তা হয়েছে ক্রমশ উন্নতিশীল। কিন্তু মানুষের আর সব জ্ঞানের মতোই বিজ্ঞানচর্চাও ভাষা-নির্ভর। ভাষার মাধ্যম ছাড়া বিজ্ঞানের সত্য প্রকাশের আর কোনো বিকল্পপথ নেই। এ সমস্যা আজ মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে।

● মাতৃভাষা ও শিক্ষা : শিক্ষার সঙ্গে মাতৃভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব শিক্ষাবিদই মনে করেন মাতৃভাষা শিক্ষার অন্যতম বাহন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ J. R. Firth মন্তব্য করেছেন, "As a first principle, fix your faith to the mother tougue"। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীর ভঙ্গিতে বলে গেছেন, 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। শুধু মনীষী শিক্ষাবিদরাই নন, বিভিন্ন বিশ্বমানের গবেষণা সংস্থাগুলিও তাঁদের বিশেষজ্ঞদের মেধা সমন্বয়ে একই মত প্রকাশ করেছেন। UNESCO সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন, 'The best mediumfor teaching is the mother tongue of the people.' সন্দেহ নেই মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম —

● বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার ক্রমোন্নতি এবং মাতৃভাষার গুরুত্ব : প্রথাগতভাবে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ইংরেজ সাহেবদের হাত ধরে। মেকেলের মতে ইংরেজি ভাষাই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম মাধ্যম। স্বভাবতই ইংরেজি ভাষাতেই আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত। কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলার রেনেসাঁস যুগের মনীষী এবং বিজ্ঞানীরী জাতীয়তাবোধ পরের মুহূর্তে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার উপর গুরুত্ব অক্ষয়কুমার দত্ত। বিজ্ঞানের নানা বিষয় যথা রসায়ন, পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত সন্দর্ভ প্রথম প্রকাশ পায় অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকাতে। স্বামী বিবেকানন্দ এবং সমসাময়িক যুগের ড. মহেন্দ্রলাল সরকারও এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর স্বপ্রতিম দূরদৃষ্টি দিয়ে শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চাতেও মাতৃভাষার অসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বিজ্ঞান জগতের অন্যতম মহারথী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বাংলায় বিজ্ঞান ধর্মী রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত 'অব্যক্ত' বিজ্ঞান রচনা এবং সাহিত্য চেতনার যুগলবন্দি। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে শান্তিনিকেতন থেকে বিজ্ঞান পুস্তিকা প্রকাশ করতে থাকেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জগদানন্দ রায়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখেরা। এর পরের যুগে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, জগনচন্দ্র ঘোষ, ড. ইউ. এন. ব্রহ্মচারী প্রমুখ দিকপাল বিজ্ঞানীরা এই কাজে ব্রতী হন। বিশ্ব বিখ্যাত পদার্থবিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু যাঁর 'বোস-আইনস্টাইন' তত্ত্ব জগদবিখ্যাত, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, 'যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান জানেন না।' স্বাধীনোত্তরকালে শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী পরিভাষা গঠনে সচেষ্ট হয়েছিলেন আরও পরে 'দেশ' পত্রিকায় সমরজিৎ কর, সমরেন্দ্র সেন প্রমুখ এই দায়িত্ব পালন করেন।

● মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার যৌক্তিকতা : শিক্ষাবিদ্ এবং মনীষীদের মত বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারছি যে সকলেই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী। বিশেষ কনো ভাষা বিজ্ঞানচর্চার শর্ত নয়। তাহলে আর্কিমিডিস, নাগার্জুন, মাদামকুরী, নীল্স বোর যাঁরা যথাক্রমে গ্রীক, সংস্কৃত, ফরাসি এবং জার্মান প্রভৃতি তাঁদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করেছেন, তাঁরা সফল হতেন না। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষার ব্যবহার শিখতে যে শিক্ষণ সময় ব্যয় হয়, মাতৃভাষায় যিনি বিজ্ঞানচর্চা করেছেন তিনি সেই বিদেশি ভাষা ব্যবহারকারীর চেয়ে দ্রুত অগ্রগতি লাভ করতে পারেন।

● মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সীমাবদ্ধতা : কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কিছু আপাত সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথম অসুবিধা হল উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব এবং পরিভাষার জটিলতা। বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞানচর্চার উপযুক্ত করে তুলতে হলে এগুলির ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিক্ষিপ্তভাবে এ ব্যাপারে কাজ করলেও এটির সম্পূর্ণায়ন আজও হয়নি। প্রতিদিন নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে। নতুন পরিভাষা জন্ম নিচ্ছে। তাই মাতৃভাষাকে বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম করতে হলে প্রতিনিয়ত উপযুক্ত অনুবাদ ব্যবস্থা ও পরিভাষা গঠনের একটি সক্রিয় পরিকাঠামো প্রয়োজন।

● বর্তমান বিশ্বায়ন এবং বিজ্ঞানচর্চা : বর্তমান পৃথিবীর বিজ্ঞানচর্চা হয়ে উঠেছে যন্ত্রনির্ভর। কমপিউটার এবং ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের উন্নত বিজ্ঞানচর্চার অপরিহার্য শর্ত। কমপিউটারের ভাষা মূলত ইংরেজি কেন্দ্রিক। যদিও কমপিউটারের ভাষা বাংলাতেও করা সম্ভব কিন্তু আমাদের মতো বহু ভাষাভাষী এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসর দেশে এই বিপুল আয়োজন এই মূহূর্তে অসম্ভব। বিশ্বের এই পরিস্থিতি বিবেচনা করলে ইংরেজি ভাষাকে আমরা বিজ্ঞান চর্চার ভাষা হিসাবে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারি না।

● উপসংহার : বিজ্ঞান চর্চার ভাষা বিচারে আমাদের গোঁড়া হলে চলবে না। মাতৃ-ভাষাকে অবহেলা বা বিদেশি ভাষা হিসাবে ইংরেজি ভাষাকে সম্পন্ন করতে পারি না। প্রাথমিক শিক্ষা এবং গণবিজ্ঞান চেতনা পারে মাতৃভাষা বাংলা যেমন অপরিহার্য তেমনি উচ্চশিক্ষা, যুক্তি পর্যায়ের বিজ্ঞান চর্চায় অপরিহার্য, ইংরেজি ভাষা মাতৃভাষার প্রতি অন্ধ আবেগবা ইংরেজি ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা বা মাতৃভাষার প্রতি বিরাগ বা ইংরেজি ভাষার প্রতি অর্থহীন মোহ — এগুলির কোনোটিই বিজ্ঞান চর্চায় কাম্য নয়। বিজ্ঞানচর্চা কোনো আবেগ প্রসূত প্রয়োজনীয়তা নয়। তাই বিজ্ঞানচর্চার ভাষা নির্বাচনে আবেগ মুক্ত হয়ে আমাদের দুটি ভাষাতেই সমান গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত পর্যায়ে ব্যবহার করতে হবে।

১৩.৪. মানব জীবনে পরিবেশের প্রভাব

● ভূমিকা : আমরা যেখানে বাস করি, তার পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডলকেই বলা হয়, 'পরিবেশ'। গাছ যেমন সজল মাটি, অবাধ আলো এবং উৎকৃষ্ট সার পেলে সতেজভাবে বেড়ে ওঠে, আমাদের বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠাটাই যেন ঠিক অনুরূপ। আমাদের সুস্থভাবে বেচে থাকার জন্য চাই উৎকৃষ্ট পরিবেশ। স্বাস্থ্য উজ্জ্বল পরমায়ুর জন্য সুস্থ পরিবেশের বড়ো প্রয়োজন। পরিবেশ ভালো না হলে, কেউ ভালো হতে পারে। আমরা জানি, 'বনে থাকে বাঘ, গাছে থাকে পাখি, জলে থাকে মাছ' অর্থাৎ এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বেঁচে থাকার উপরে পরিবেশের অন্তরক্রিয়া তথা বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিতি বজায় থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং পরিবেশকে আমরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফিরিয়ে দিই। পরিবেশের খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে আমরা খাদ্যগ্রহণ করে বেঁচে থাকি। পরিবেশের জল, বায়ু, অরণ্য আমাদের জীবনধারণের রসদ যোগায়। শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাব মানুষের উপর রয়েছে তা বলাবাহুল্য।

● পরিবেশের সংজ্ঞা : মানুষকে ঘিরে যাবতীয় জড় ও সজীব উপাদানগুলিকে একত্রে পরিবেশ বলে। অর্থাৎ আমাদের চারপাশের সামগ্রিক ভৌত ও জৈব পরিবেশের অন্তঃক্রিয়ায় সৃষ্ট অবস্থা যা আমাদের জীবনধারাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তাকে পরিবেশ বলা হয়। আমাদের প্রত্যেকের বাসস্থানের চারদিকে অবস্থিত জড় উপাদান — জল, বায়ু, মাটি, সূর্যালোক, উষ্ণতা ইত্যাদি পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এগুলি ভৌত পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। সেই সঙ্গে রয়েছে উদ্ভিদ, প্রাণী ও আনুবীক্ষণিক জীব — এগুলি জৈব পরিবেশের অন্তর্গত। এদের প্রভাব মানবজীবনের উপর সব থেকে বেশি।

● <u>পরিবেশের স্বরূপ</u> : পরিবেশকে আমরা সাধারণত দুটো রূপে দেখতে পাই। যেমন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কৃত্রিম পবিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ আলো, বাতাস, জল, মাটি, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, হ্রদ, জলাশয়, ঝরণা, বনভূমি, তৃণভূমি, মরুভূমি, মেরু-অঞ্চল, তৃণলতা, গুল্ম, বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ,পশুপাখি, আনুবীক্ষণিক জীবসহ যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত। আবার ভৌগলিক গঠন, জলবায়ু, উষ্ণতার তারতম্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যদিকে কৃত্রিম ভাগ করা যায় — জলজ এবং স্থলজ পরিবেশ। এই সমস্ত পরিবেশের প্রভাব রয়েছে পরিবেশ ইত্যাদি।

● <u>প্রাকৃতিক পরিবেশ</u> : মানুষের জীবন ধারনের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে জল, অক্সিজেন, খাদ্যই গ্রহণ করে না; মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই পরিবেশের ভূমিকা রয়েছে। ঋতু পরিবর্তন, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন এই পরিবেশের প্রভাবজাত। প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত জলজ পরিবেশ বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান। স্থলজ পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সমতলের পরিবেশ, অরণ্যের পরিবেশ, পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশ, মরুঅঞ্চলের পরিবেশ, মেরু অঞ্চলের পরিবেশ।

● <u>পারিবারিক পরিবেশ</u> : কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে পারিবারিক পরিবেশ বা বাড়ির পরিবেশের প্রভাব মানুষের উপর সবথেকে বেশি। জন্মের পর থেকেই শিশুরা মা ও বাবার যত্নে পালিত হয় এবং তাদেরকেই ভালোভাবে চিনতে বা জানতে শেখে। বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা বাড়ির কাছের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়। বাবা-মা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে গৃহস্থালীর কাজ, রীতি-নীতি, আদব-কায়দা অনুকরণ করতে শেখে। বড়োদের কাছ থেকে নীতি মূলক উপাখ্যান শুনে তাদের কল্পনা শক্তির যেমন বিকাশ ঘটে তেমনি ন্যায়-নীতি বোধও জাগ্রত হয়। আবার গুরুজনদের অশালীন আচরণ ও ব্যবহারও তারা অনুকরণ করে ফেলে। তবে বাড়ির গুরুজনদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশুদের চরিত্র, আচার-আচরণ প্রভৃতি গুণাবলীর উন্মেষ শিশুমনে ঘটতে থাকে।

● <u>বিদ্যালয়ের পরিবেশ</u> : পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিশু যেমন আহরণ করে, তেমনি বড়ো হয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও শিশুরা তাদের চারিত্রিক গুণাবলী আযত্ত করে। জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে বিদ্যালয় পরিবেশ শিশুকে সাহায্যকরে। এই পরিবেশ থেকেই শিক্ষার্থীদের সততা, শ্রদ্ধাভক্তি, সম্প্রীতি, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে।

● <u>সামাজিক পরিবেশ</u> : একজন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সমাজে নানা বিষয়ে বা কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন সে সামাজিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সামাজিক মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতির হয় সামাজিক পরিবেশ থেকে। মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ সমাজ কল্যাণের বা সমাজের ফিশ্ থাকার কিম্বা ইচ্ছা তৈরি হয় সামাজিক পরিবেশ থেকে। যে জন্য মানবজীবনে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব সর্বাধিক।

● <u>সাংস্কৃতিক পরিবেশ</u> : এরপরে আসে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবের দিক — যে পরিবেশ থেকে একজন মানুষ সভ্য নাগরিক হয়ে ওঠার প্রেরণা লাভ করে। বিদ্যালয়ে ও সমাজে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দেশ ও জাতি সম্পর্কে একটা চেতনা জাগে।

● <u>পরিবেশ দূষণ</u> : মানুষ পরিবেশ থেকে যেমন নিয়েছে, তেমনি পরিবেশকে দূষিত ও করেছে। সেই দূষণের প্রভাব আজ সর্বত্র। জল, বায়ু, আকাশ, শব্দ, মাটি সবই আজ দূষণের করাল গ্রাসে পতিত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রমাগত লুণ্ঠনের ফলে সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশও আজ দূষিত। মূল্যবোধের অবশায়, নীতিহীনতা, সুবিধাবাদ ও স্বার্থপরতার ছড়াছড়ি মানুষের সামাজিক সম্পর্কে এনেছে ভাঙন দশা। যন্ত্রের প্রভাবে মানুষ হয়ে উঠেছে যন্ত্র-সর্বস্ব, কৃত্রিম ও আন্তরিকতাবিহীন ফলে মানুষের মনুষ্যবোধ আজ ভুলুণ্ঠিত।

● <u>উপসংহার</u> : যে পৃথিবী মানুষের বসবাসের একমাত্র আবাসস্থল, সেই পৃথিবী আজ নানাভাবে দূষিত। অথচ এই পৃথিবীর পরিবেশ থেকে মানুষ পেয়েছিল প্রাণধারণের রসদ, অস্তিত্ব রক্ষার উপকরণ। কিন্তু নিতে নিতে মানুষ আজ ভুলে গেছে তার চারপাশের পরিবেশকে। ফলে পরিবেশের দূষণের প্রভাবেও মানুষ আজ অতিষ্ঠ। তাই মানুষকে সচেতন হতে হবে এই পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখার । তা না হলে অস্তিত্ব যে বিপন্ন হবে। পরবর্তী প্রজন্মের 'দুধে-ভাতে' থাকার স্বপ্নও বিলীন হয়ে যাবে।

১৪. <u>অনুবাদ</u>

একবার দুই মহিলা একটি শিশুর অধিকার নিয়ে ঝগড়া করে ন্যায় বিচারের জন্য বিচারকের শরণাপন্ন হলেন। বিচারক

জল্লাদকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, "শিশুটিকে দু-খন্ড করে কেটে অর্ধেকটাএকজনকে আর বাকি অর্ধেকটা আর একজনকে দাও।" মহিলা দুজনের একজন এই আদেশ শুনেও চুপ করে রইলেন, কিন্তু অন্যজন কাঁদতে শুরু করলেন।

১৫. ১৫.১. প্রতিবেদন

জলা বোজানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ : আবাসন আবশ্যক কিন্তু জলা বুজিয়ে বা সবুজ ধ্বংস করে নয় — ১১ই সেপ্টেম্বর এই সিদ্ধান্ত জানালো ব্যারাকপুরের মানুষ। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও স্থানীয় 'বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম' বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন পরিবেশ বিষয়ক এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল। ওই দিন সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত স্থানীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিক হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আলোচনা সভা। এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'জলা বুঝিয়ে সবুজ ধ্বংসকরে আবাসন নয়'।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহুরে জীবনে যে আবাসনের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে — এ কথা কেউ আর অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু পুকুর বোজানোর এবং নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন করার পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়ংকর, সে কথা বোঝার সময় সবার এসেছে। এর ফলে ক্রমে ক্রমে আমরা পরিবেশকে আমাদের বসবাসের অযোগ্য করে তুলছি। আলোচনা সভায় এসব ব্যাপারই বিস্তৃত আলোচনা করেন পরিবেশ বিজ্ঞানী বিধান সাহা, মহাশয়, ফোরাম সম্পাদক শ্রী শুভাশিস দাস মহাশয়। এক শ্রেণির আধুনিক আবাসন ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদের যোগসাজশে জলাভূমি বুজিয়ে এবং সবুজ ধ্বংস করে বহুতল বাড়ি নির্মানের বিরুদ্ধে সভায় সকলে ক্ষোভ দেখান। ব্যারাকপুর সংলগ্ন অঞ্চলকে পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত করার সংকল্প ঘোষিত হয় 'বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম'-এর তরুণ সম্পাদকের কন্ঠে। শহরকে সবুজ ও দূষণমুক্ত করে তোলার প্রতিজ্ঞা করেন ব্যারাকপুরের কয়েকশো মানুষ।

১৫.২. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপযোগিতা বিষয়ে দুই শিক্ষকের সংলাপ

অয়নবাবু : মানসবাবু, আজ তো ক্লাস ইলেভেনের বাংলা খাতা দেখলেন; কেমন ফল করেছে ছেলেরা?

মানসবাবু : একেবারেই ভাল না। দু-তিন জন বাদে বাকিদের অবস্থা ভয়াভয়। আসলে শুধু বিষয় নয়। ভাষা হিসেবেও এখনকার প্রজন্ম বাংলাকে গুরুত্বই দেয় না।

অয়নবাবু : ঠিকই বলেছেন। আমাদের স্কুলের কথাই ধরুন। বাংলা বাদ দিয়ে বাদবাকি সমস্ত বিষয়ই প্রত্যেক ইংরেজিতে পড়ে, ভবিষ্যতেও পড়বে। তাই খামোখা বাংলা পড়ে বা বাংলায় পড়ে কী লাভ — শুধু এই চিন্তাই তাদের মাথায় ঘোরে।

মানসবাবু : শুধু পরীক্ষা ব্যবস্থা নয়। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। উচ্চতর ক্ষেত্রে গবেষণা কিংবা পঠন পাঠন বাংলা মাধ্যমে করলে প্রভূত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, সেটা ইংরেজিতে করলে সুফল মেলে — এই ধারণা যতদিন যাচ্ছে তত বদ্ধমূল হচ্ছে।

অয়নবাবু : বিজ্ঞানের ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে আমার ও একই অভিজ্ঞতা। লেখাপড়ার উপকরণ, বইপত্র — সবকিছুই ইংরেজি নির্ভর। তাই বিজ্ঞানে মাথা আছে এমন মেধাবী থেকে ।

মানসবাবু : এই ধারণা ভাঙতে আমাদেরই এগিয়ে আসা উচিত। মাতৃভাষায় পাঠ্যবই, গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখতে হবে, আরও বেশি করে বিদেশি রচয়িতাদের রচনা অনুবাদ করতে হবে। তাতে করে ভাষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান — সব কিছুই উপকৃত হবে।

অয়নবাবু : আপনার প্রস্তাব ভেবে দেখার মত। তবে এই নিয়ে একজনকে না একজনকে দাঁড়াতেই হবে। তবেই না পাশে এক যোগ হয়ে এগারো হবে।